বিদআতি ও বিরোধীদের সাথে আচরণনীতি

শাইখ খালিদ বাতারফি হাফিযাহুল্লাহ

একাদশ দরস

বিদআতি ও বিরোধীদের সাথে আচরণনীতি

শাইখ খালিদ বাতারফি হাফিযাহুল্লাহ

একাদশ দরস

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AL HIKMAH MEDIA

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين – الدرس الحادي عشر، للشيخ الأمير خالد باطرفي – حفظه الله –

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ১১:০৯ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: শাবান ১৪৪২ হিজরি

প্রকাশক: আল মালাহিম মিডিয়া

হামদ ও সালাতের পর-

আলহামদুলিল্লাহ, ইতিপূর্বে আমরা বিদআতিদের সঙ্গে আচরণের দশটি মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। **এখন আমরা এগারো নাম্বার মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করবো (ইনশাআল্লাহ)।**

আর তা হলো; বিদআতের দিকে আহ্বানকারীর তাওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে।

এটি সালাফদের মাঝে মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলাগুলোর অন্যতম। বিদআতের দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে সালাফের পারস্পরিক মতপার্থক্যগুলোকে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ শুধুমাত্র শাব্দিক ইখতেলাফ মনে করেন।

বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তির তাওবা কবুল না হওয়ার ব্যাপারে সালাফগণ নিম্নোক্ত হাদিসটি দিয়ে দলিল পেশ করে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه

"কিছু মানুষ দ্বীন থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে, ধনুক থেকে তীর যেভাবে বের হয়ে যায়; দ্বীনের পথে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।"

উক্ত বক্তব্যটিকে আরেকভাবে মূল্যায়ন করা যায়। যেমন: ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যাকারী ব্যক্তির তাওবা কবুল হয় না; বরং তার তাওবা কবুল হওয়া না হওয়া আল্লাহ ও তার মাঝেই থাকে। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতেও পারেন নাও করতে পারেন। আলোচিত মাসআলার ক্ষেত্রেও এমনটি বলা চলে।

সুতরাং আলোচিত বিষয়ে ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ'র কৃত বক্তব্যগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। পাশাপাশি বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তির তাওবা কবুল না হওয়ার বিষয়ে সালাফের বিরোধপূর্ণ বক্তব্যগুলোর রহস্য উদঘাটনেরও কিঞ্চিত চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য হচ্ছে, ব্যক্তির গুনাহ যত বেশিই হোক; আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এ ব্যাপারে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি দিয়ে দলিল পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الزمر: 53

"অর্থ: (হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলুন: হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছো! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু"। (সূরা যুমার ৩৯:৫৩)

বিদআতের পথে আহ্বানকারী ব্যক্তির তাওবা কবুল হবে না বলে যারা বক্তব্য দিয়ে থাকেন, ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাদের মতকে খণ্ডন করে বলেন যে, সার্বিক বিচারে উক্ত আয়াতটি এমনসব ব্যক্তির বিপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাদের বিপক্ষেও দলিল, যারা ইসরাইলী এই রিওয়ায়াত - "বিদআতের আহ্বানকারী ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে বলা হবে 'তুমি যাকে গোমরাহ করেছ তার কী উপায় হবে?"- দ্বারা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো: এমন কিছু মানুষই ইসরাইলী রিওয়ায়াতটি দ্বারা দলিল পেশ করে থাকে, যাদেরকে হাদিসের ইমাম মনে করা হয়; অথচ তারা আদৌ উলামায়ে কেরামদের অন্তর্ভুক্ত কেউ নন। এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে আবু আলী আল আহওয়াজী এবং তার মতো এমন আরো অনেকে, যাদের সহীহ হাদিস ও মাওযূ হাদিসের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতাটুকুও নেই। এমনকি কোন হাদিসটি দলিল হওয়ার উপযুক্ত সেটাও তারা বুঝতে পারে না। বরং আলোচিত বিষয়ে অনুমান নির্ভর যা কিছু পায় তা দিয়েই দলিল দিয়ে দেয়।

এদের মাঝে আরেকটি দল আছে, যারা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ'র বিভিন্ন বর্ণনাকে নকল করে। অথচ এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর মাযহাব সকল ইমামের কাছেই স্পষ্ট। কেননা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন যে, মানুষকে কুফরের দিকে আহ্বানকারী এবং আপন দ্বীন ত্যাগে বাধ্যকারীর তাওবা

যেমনিভাবে কবুল করা হবে বিদআতের দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির তাওবাও ঠিক তেমনি কবুল করা হবে।

যেমন সুফিয়ান ইবনে হারব, হারিস ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে আমর, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ও ইকরামা ইবনে আবু জাহেলের মতো কুরাশইদের অনেক নেতার তাওবাও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন, যাদের আহবানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অনেকেই কুফরি অবস্থায় নিহত হয়েছে। পরিশেষে তারা সর্বাধিক ভালো মানুষ হিসাবে সবার কাছে সমাদৃত হয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমার ঘোষণাও করেছেন-

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

"অর্থঃ আপনি কাফেরদের বলুন: তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে"। (সূরা আনফাল ৮:৩৮)

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের আগে কাফেরদের সবচেয়ে বড় ধর্মপ্রচারক ছিলেন। মুসলমানদের কষ্ট দেওয়াই ছিলো তাঁর নিত্য দিনের কাজ। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন-

يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ مسند أحمد ط الرسالة(২৯/ ৩৬০)

"অর্থ: হে আমর! তুমি কি জান না! ইসলাম তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়"।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন: "বিদআত ও কুফরের পথে আহ্বানকারী ব্যক্তি যদি কাউকে পথভ্রষ্ট করে তাহলে সে তো নিজের গুনাহের বোঝা বহন করবে। এমনকি সে যাকে পথভ্রষ্ট করেছে কেয়ামত পর্যন্ত তার গুনাহের বোঝা সামান্যও হালকা করা হবে না এবং দ্বিতীয় জনকে বিদআত গ্রহণ ও বিদআতের অনুসরণের কারণেও শাস্তি দেয়া হবে"।

এসব কিছুর পরও যদি বিদআতের আহবায়ক খাঁটি দিলে তাওবা করে থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। এমনকি তার কারণে যারা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে তাদের কোন গুনাহের বোঝাও তাকে আর বহন করতে হবে না। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে: তাওবা করে দ্বীনের আলোয় আলোকিত হবার আগে সে ইসলামের যেমন ক্ষতি করেছে ঠিক তেমন উপকার যদি না করে থাকলে তার তাওবা করা আর না করা এক বরাবর।

সুতরাং একথা অকপটে বলা চলে যে, তাওবা করার পর এমন ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে মানুষকে বিদআত হতে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। কেননা সীরাতের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, কাফের ও বিদআতিদের অনেক বড় বড় নেতারা তাওবা পরবর্তী সময়ে ইসলাম ও সুন্নাহর দাঈ বনেছেন এবং খুব জোরালো ভাষায় মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন।

ফিরাউনের রাজ দরবারের বড় বড় জাদুকরদের কথা তো আমাদের সকলেরই জানা। ইসলাম গ্রহণের আগে ওরা সকলেই কাফেরদের লিডার ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে ইজ্জতের মৃত্যু দান করেন।

ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “যখন কোন বিদআতি এ উদ্দেশ্যে তাওবা করে যে, সে তার ভুল থেকে সরে আসবে এবং অতীতকে মুছে ফেলবে তখন তার জন্য জরুরী হলো, মানুষকে ভুল পথ থেকে ফিরে এনে হেদায়েতের পথ দেখিয়ে দেওয়া এবং জাতির সামনে পূর্বের ভুলটাকে স্পষ্ট করে দেওয়া। এতে করে আল্লাহ তায়ালা হয়তো তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং সঠিক পথের দিশা দিবেন”।

বিদআতির তাওবা কবুল না হওয়ার বিষয়ে সালাফের বিরোধপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক কারণ ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

“এক. এখানে তাওবা বলে ঐ তাওবার কথা বোঝানো হয়েছে, যে তাওবার কারণে আল্লাহ তায়ালা নিজ হক্কের ক্ষেত্রে তাকে ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু মাজলুমের হক্ক থেকে সে বাঁচতে পারবে না।

দুই. ‘বিদআতির তাওবা গ্রহণ করা হবে না’ -এ কথার ব্যাখ্যা হলো, কেউ ইসলামের নামে মনগড়া একটি নতুন ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে যা আল্লাহ ও আল্লাহর

রাসূল বৈধ বলে সমর্থন করেন না। এমনকি এই বাতিল ধর্ম যখন তার সামনে মন্দ আমল রূপে পেশ করা হবে তখন সে তা উত্তম মনে করবে। আর যতদিন সে এটাকে উত্তম মনে করবে ততদিন সে এটা থেকে তাওবা করবে না, কেননা তাওবার মূল অর্থই হলো নিজ অপরাধের স্বীকৃতি দেওয়া এবং অপরাধ সম্পর্কে অনুতপ্ত হওয়া। অথবা এমন হয় যে সে শরীয়তের কোন হুকুম ছেড়ে দিলো যা তার উপর ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব ছিলো। যখন সে জানবে যে সে এমন কাজ ছেড়ে দিয়েছে যা তার উপর ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব ছিলো তখনি সে এই ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুতপ্ত হবে। পক্ষান্তরে তার এই ছেড়ে দেয়াকে যদি সে ভালোই মনে করে তাহলে তো সে আর তাওবা করবে না।

তিন. 'বিদআতির তাওবা কবুল না হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ধমকি এসেছে।' -এমন বক্তব্যের উত্তরে তিনি বলেন যে, বিদআতি তো মনে করে যে, আমি হেদায়েতের উপর আছি; যার ফলে সে তাওবা করলে তা কবুল করা হয়। যেমনটি কাফেরের তাওবা কবুল করা হয়।

মোটকথা, বিদআতের দায়ীদের তাওবা কবুল হবে না বলে মতামত প্রদানকারীদের উক্ত বক্তব্যের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. পূর্বে উল্লেখিত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তারা এমন বক্তব্য দিয়েছেন।

২. বিদআতপন্থীদের কৃত বিদআতের বিরুদ্ধে কঠোরতা আরোপ করা এবং মানুষদেরকে তাদের বিদআত থেকে রক্ষা করার জন্যই মূলত উলামায়ে কেরামগণ এমন বক্তব্য দিয়েছিলেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন কঠোরতা তারা শরীয়তের দলিল থেকেই বুঝেছেন"।

সুতরাং বোঝা গেল, বিদআতির তাওবা কবুল হওয়ার দলিলগুলো শক্তিশালী, চাই এগুলো কিতাবুল্লাহ থেকে হোক অথবা রাসূলের সুন্নাহর দলিল হোক অথবা ঐ সমস্ত নসের দলিল হোক, যেগুলোর মধ্যে বিদআতের চেয়ে জঘন্য অপরাধের বিষয়ে তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা এসেছে।

কুফুরির দিকে আহ্বান এবং কুফরের অস্তিত্ব রক্ষায় ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করা সত্ত্বেও (তাওবা করলে) আল্লাহ তাওবা করেন। সুতরাং বিদআতের দিকে আহ্বানকারী - যখন একনিষ্ঠভাবে বিদআতের দিকে ডাকে, এমনকি সেজন্য

দোয়াও করে অতঃপর - হিদায়াতের পথে ডাকতে শুরু করে তাহলে তো এটা তার জন্য অনেক বড় বিষয়। অর্থাৎ তার প্রভাব - সে যাদেরকে বিদআতের দিকে আহ্বান করতো, তাদের উপর – অনেক বেশি পড়বে।

বিদআতিদের সাথে আমাদের আচরণবিধির আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি।

উপসংহার

সর্বশেষ আমরা আলোচনা করবো বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে আমাদের আচরণবিধি কেমন হবে - এ বিষয়ে।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, এধরণের লোক আমাদের দাওয়াতের উপযুক্ত স্থান। সুতরাং তাদের সাথে আমাদের দাওয়াতের পদ্ধতি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যদি আপনি কারো অপরাধ দেখে তার সাথে প্রথমেই আঘাতমূলক আচরণ করেন তাহলে সে আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। যখন আপনি কোন ব্যক্তির কাছে যাবেন এমতাবস্থায় যে, তার মাঝে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা, এমনকি মূর্তির প্রতি রয়েছে তার বিশেষ ঝোঁক; ধরে নিন তার মাথায় বড় একটা মূর্তিও রয়েছে, আর আপনি এসেছেন এই মূর্তিগুলো ভাঙ্গতে, তাহলে আপনার থেকে তার দাওয়াত গ্রহণ করা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এমন হতেই পারে যে, সে আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে না। আর তখন আপনি হক্বের বিষয়ে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বনে যাবেন।

সুতরাং আবশ্যক হলো জামাতের সকল নিয়ম নীতি অনুসরণ করে কথা বলা। আর আমাদের মূল উদ্দেশ্য তো হলো তাদেরকে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও সালফে সালিহীনদের মতের উপর এক করা এবং কুরআন সুন্নাহর দলিলের বাইরে শুধুমাত্র অমুক শাইখের, তমুক আলেমের অনুসরণের সংকীর্ণতা থেকে বের করে আনা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা এবং সাহাবায়ে কেরাম, সালাফে সালেহীনের বক্তব্যের দিকে ফিরিয়ে আনা।

এখন যদি আমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রথমেই বলি যে, ভাই! তোমার এই নেতা দ্বারা কোন ফায়দা নেই অথবা তোমার অনুসরণীয় অমুক ব্যক্তিটি কাফের অথবা বিদআতি। এভাবে বলা শুরু করলে তো সে আর আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে না।

এ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ কাউকে দাওয়াত দেয়ার সময় সরাসরি সংগঠনের সমালোচনা করতেন না, বরং সংগঠনের মাঝে যে সকল ভুল রয়েছে সেগুলো ধরিয়ে দিতেন। আর যেহেতু অধিকাংশ মানুষই বিপরীত কোন দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আদবের বিষয়টি লক্ষ্য করে, তাই শাইখকে কারো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি চুপ থাকতেন এবং বলতেন, বরং এর চেয়ে বড় সমস্যা নিয়ে কথা বলতেন।

তিনি আরো বলতেন, যখন অন্য কোন রাষ্ট্র থেকে কেউ সাক্ষাত করতে আসে সাধারণত সর্বপ্রথম তাকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন'? উদাহরণস্বরূপ সে হয়তো বললো, 'সৌদি থেকে'। এখন তাকে যদি বলা হয় - বাদশাহ ফাহাদতো কাফের। সে হতচকিত হয়ে উঠবে এবং বলবে, 'আরে, ফাহাদ কাফের'!?।

অথবা আরেকজন হয়তো ইয়ামান থেকে এসেছে। তাকে বলা হলো, 'আলী আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ কাফের'। সেও হতচকিত হয়ে উঠবে এবং বলবে, 'আরে সালেহ কাফের!?'। তো শাইখ বলেন; এই ধরণের আচরণ সীমালঙ্ঘন। কেননা এই আগত ব্যক্তি একজন মুসলিম এবং সে সারা জীবন জেনে এসেছে এই লোকগুলোও মুসলিম।

অনেকের অবস্থা এমন যে সে কথায় কথায় 'কালাল্লাহু, ক্বালা রাসুলুল্লাহ' বলে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সে এই ধাঁচে বেড়ে উঠেনি। অথবা সে এটা বুঝানোর চেষ্টা করে যে, সে সরাসরি কুরআন সুন্নাহকেই অনুসরণ করে কোন ব্যক্তির অনুসরণ করে না। অনেক মানুষই এমনটি করে, বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এদের প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে - এরা ব্যক্তি ও কুরআন সুন্নাহর মাঝে সমন্বয় করতে পারে না। তাই যখন তাকে কুরআন সুন্নাহ থেকে উদ্বৃতি দেয়া হয়, তখন সে বলে ওমুক শাইখতো এটা এভাবে বলেছেন। এমতাবস্থায় আপনি যদি তাকে বলেন যে, 'ওমুক তমুক বাদ দিয়ে আপনার উচিত কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, কেননা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সবার কথাই গ্রহণ ও বর্জন করা হয়' - তখন আপনার ওমুক তমুককে নিয়ে কথা বলাটা তার জন্য সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। কেননা দ্বীন শিক্ষা দেয়া, আল্লাহর পথে দাওয়াত ও বিভিন্ন ইসলামী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অনেকেই তাদের নেতা বা শাইখ নিয়ে সরাসরি সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। তবে প্রাথমিক অবস্থায় এই বিষয়গুলো মানুষ মেনে নিতে না পারলেও সময়ের সাথে সাথে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়।

সুতরাং আমি বলবো বিদআতি এবং আমাদের বিরোধীদের প্রশংসা এবং নিন্দার ক্ষেত্রে আমরা ইনসাফ করবো। তাদের মধ্যে যতটুকু হক্ক রয়েছে সেটা বলবো, আর বাতিলটুকু রদ করবো ।

সুতরাং যখন আমরা মুসলিম যুবকদের কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ এবং সালফে সালেহীনের রীতি-নীতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেবো এবং তারা হক্ককে ভালোভাবে বুঝবে, তখন এই সকল প্রতীকগুলো এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আমরা কোন কাজকে প্রত্যাখান করতে চাইনা। কিন্তু কিছু কিছু মানুষের কাজ আপনিতেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। কেউ তাযিম করতো অনুসরণীয় কিছু ব্যক্তিবর্গের, নেতাদের এবং মাশাইখদের। আর যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সকল লোকেরা তাকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং বাতিলেরে দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তার কাছে প্রত্যেক শাইখ, নেতা এমনকি সকলের কাজ-কর্ম প্রত্যাখ্যাত মনে হয়। এরপর দেখা যায় সে অতীতের উলামাদের ব্যাপারে, হক প্রচারকারী আলেমদের ব্যাপারে, এমনকি এমন আলেমদের ব্যাপারে দুঃসাহস দেখায় যাদের মাঝে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণ বেশি। সকলের উপর সে দুঃসাহস দেখায়। সে আপনাকে বলবে, 'বাদ দিন এসব আলিমদের কথা!'।

অবশ্যই আমরা যখন তাকে অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের তাযীম, ব্যক্তি পূজা এবং মাশাইখের পূজা থেকে বের করবো, তখন সেক্ষেত্রে মধ্যমপন্থাটাই কাম্য। অর্থাৎ এ সকল ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি করা যাবে না। এমন যেন না হয় যে সে সবাইকেই তুচ্ছ জ্ঞান করে। আবার সকলকে শ্রেষ্ঠও না বানায়। অথবা অনুসরণীয় ব্যক্তিদের তাযীম করবে আর বাকি লোকদের ছেড়ে দিবে। এই বিষয়টি এখানে টেনে এনেছি সতর্ক করতে, কেননা এ ক্ষেত্রে তা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ তারাই আমাদের দাওয়াহর ক্ষেত্র।

নেতৃস্থানীয় লোকদের দাওয়াত দেয়ার তুলনায় সাধারণ লোকদের দাওয়াত দেয়া সহজ। কেননা সাধারণ মানুষ কারো সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং সে স্বাভাবিক ফিতরাতের উপর থাকে। সুতরাং হক্ক বুঝাটা তার জন্য খুবই সহজ। অবশ্যই সে তাৎক্ষণিকভাবে তা অনুসরণ করবে। কারণ তার কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। আর অমুক ভালো তমুক ভালো জাতীয় কথা-বার্তায় তার মাঝে দ্বন্ধ তৈরি হয়। তাই হয়ত সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে আর আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিবেন। ফলে আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ও সন্তুষ্টি তার কাছে নিজের পছন্দ ও সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য পাবে। অথবা বিপরীত দিকে উল্টে যাবে। ফলে তার কাছে তার নিজের এবং তার শাইখ ও নেতৃবৃন্দের ভালোবাসা কিতাবুল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর উপর প্রাধান্য পাবে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি এই চিন্তা-চেতনা আমাদের থেকে দূর করেছেন।